ফাদার দ্যতিয়েনের রচনা : গদ্যশৈলীর অভিনবত্ব

মারুফা আখতার*

[**সারসংক্ষেপ :** বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে এই ভাষার চর্চা করেছেন অনেক বিদেশি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এই ভাষার সাহিত্য সৃষ্টিতে অংশও নিয়েছেন। তেমনি একজন ভিনদেশি বাংলা ভাষাপ্রেমিক ফাদার দ্যতিয়েন, যার বাংলা ভাষার জ্ঞান ও দক্ষতা মাতৃভাষার মতো। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষাকে আয়ত্তে এনে বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব শৈলী সৃষ্টিকারী সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন, যেখানে অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা ও এই ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা। তাঁর গদ্যশৈলী বাংলা গদ্য পরম্পরায় এক স্বতন্ত্র রূপ উপস্থাপন করেছে। তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের সম্মিলনে তিনি তৈরি করেছেন বাংলা গদ্যের ছন্দবদ্ধ, ঝরঝরে এক অভিনব শৈলী। এই প্রবন্ধে তাঁর গদ্যের অভিনবত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।]

হাজার বছরের ইতিহাসে সময়ের সঙ্গে বাংলা ভাষা যেমন ঋদ্ধ হয়েছে, তেমনি বিস্তৃত হয়েছে এই ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পরিধি। দেশের সীমা অতিক্রম করে এই ভাষা আজ অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক রূপ ও স্বীকৃতি। যার প্রভাব পড়েছে বিদেশিদের মধ্যেও। বাঙালির পাশাপাশি অনেক বিদেশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করছেন। এঁদের কেউ কেউ এই ভাষায় এতটাই দক্ষ হয়েছেন যে, তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বাংলা ভাষা নবরূপ লাভ করেছে। ফাদার দ্যতিয়েন (১৯২৪-২০১৬) এমনি একজন, যাঁর গদ্য বাংলা সাহিত্যে উন্মোচন করেছে এক নতুন দিগন্ত। তাঁর গদ্যশৈলী বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব সংযোজন।

ফরাসিভাষী ফাদার দ্যতিয়েন সন্ন্যাসী হিসেবে ভারতবর্ষে আগমনের (১৯৪৯ সালে) পর বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করেন। আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় মাত্র ১০ বছরের প্রচেষ্টায় তিনি অর্জন করেন বাংলা ভাষায় গদ্য সৃজনের অসাধারণ দক্ষতা। সন্ন্যাস ধর্ম পালনের পাশাপাশি তিনি গদ্যছন্দে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার নানা অনুষঙ্গ তিনি স্বকীয় রচনাশৈলীতে প্রকাশ করেন, তাঁর *ডায়েরির ছেঁড়া পাতা* (১৯৭১), *রোজনামচা* (১৯৭৩), *আটপৌরে দিনপঞ্জি* (২০১৩), *লালপেড়ে গল্পাবলি* (২০১৫) ও *সাদাসিধে খসড়া* (২০১৭) গ্রন্থে। রচনাগুলি ডায়েরির আদলে তৎসম, তদ্ভব ও দেশি শব্দের মেলবন্ধনে উদ্ভাবিত এক নিজস্ব গদ্যশৈলীতে রচিত। তাঁর সাবলীল, প্রাঞ্জল, নির্ভার এই গদ্য মুগ্ধ করেছিল বাংলার পাঠককে। 'প্রাচীন অচার্যেরা বলে গেছেন, গদ্য হচ্ছে লেখকের প্রতিভা-বিচারের নিকষ পাথর। নিকষে সোনা ঘঁষে তার মূল্য যাচাই করা হয়। তেমনি লেখক-প্রতিভার পরিমাপ করতে হলে তাঁর গদ্য রচনা বিশ্লেষণ করাই যুক্তিযুক্ত' (অসিতকুমার, ১৯৫৮ : ভূমিকা)। দ্যতিয়েনের গদ্য আলোচনা করলে বোঝা যায়, কী অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শ সেখানে প্রতিফলিত। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'সাহিত্য হবে তখন, যখন ভেতরে গান থাকবে' (ফয়জুল, ২০১৫ : *প্রথম আলো*, ১৩ ফেব্রুয়ারি)। তাই কোনোভাবে লেখায় ছন্দপতন যেন না হয় এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা

* সিনিয়র প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ফিরোজা বাশার আইডিয়াল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সচেতন থাকতেন। ভাব, ভাষা, ছন্দের পরিপূর্ণ মেলবন্ধন সম্পন্ন করেই তিনি তাঁর বাক্যের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

কল্পনা ও অনুভূতির মিলিত প্রকাশ সাহিত্য। যা ভাষা ও শব্দের উপযুক্ত সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। এই অনুভূতি পাঠককে স্পর্শ করলে তবেই লেখকের সার্থকতা। পরিপূর্ণ ভাব সম্বলিত বাক্য পাঠককে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। মনে সৃষ্টি করে অনুরণন। ব্যক্তিভেদে এই সৃজন ক্ষমতায় রয়েছে ভিন্নতা। কারণ একেকজন লেখক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই অবস্থা, প্রেক্ষিত ও পরিবেশের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে লেখকের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষার এই পরিবর্তন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গির এই ধরনই হলো শৈলী বা স্টাইল (Style)। মানুষ যখন থেকে সাহিত্য চর্চা করছে, তখন থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে রীতি বা শৈলী সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তার সূচনা হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ভাবনায় :

> স্টাইল সমস্ত রচনায় উপস্থিত থাকে না। কোনো রচনায় সেটি উপস্থিত থাকতে পারে আবার কোনো রচনায় স্টাইলটি থাকে অনুপস্থিত। চিন্তা ও গঠনের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে; ফলে চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তার গঠনগত পরিবর্তন যদি সার্থকভাবে ঘটতে পারে তবে সেই রচনায় সৃষ্টি হয় স্টাইলের এবং যে রচনাটিতে এটি ঘটতে পারে না সেই রচনাটিকেই স্টাইলহীন বলতে হবে। (বিভাবসু, ২০১৪ : ভূমিকা)

তবে মনে করা হয় প্লেটোর স্টাইল সম্পর্কিত ধারণায় কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাঁর মতে স্টাইলকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় না। তবে এরিস্টটল স্টাইলকে রচনার বস্তুগত উপাদান ও গুণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি মনে করতেন, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে স্টাইলের পরিবর্তন হয় এবং 'স্টাইলের প্রকৃতি নির্ধারিত হতে পারে লেখকের নাম অনুসারে, সময় অনুসারে, ভাষা অনুসারে, বিষয় অনুসারে, রচনার উদ্দেশ্য অনুসারে, দর্শকের প্রকৃতি অনুসারে এবং ভৌগোলিক স্থান অনুসারে' (বিভাবসু, ২০১৪ : ভূমিকা)। তবে 'স্টাইল' সম্পর্কিত ধারণা শুধু প্লেটো ও এরিস্টটলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন সময়ে অনেকেই স্টাইলকে সংজ্ঞায়িত করেছেন নানাভাবে। আর এই সমস্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শৈলী সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন সমালোচনা পদ্ধতি।

বর্তমানে শৈলীর পরিধি অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। লেখকের বিশিষ্টতা এই স্টাইল বা শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেখানে তাঁর মানসিকতারও প্রতিফলন ঘটে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে লেখকের শৈলী, শব্দ বা বাগ্‌ভঙ্গির ব্যবহারে। 'কেননা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রয়েছে ভাষার এক সাযুজ্য বন্ধন' (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ : ০৯)। সচেতন ও অবচেতনভাবে সৃষ্ট ভাষাগত উপায়ের মাধ্যমে লেখক পাঠকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। তাই স্টাইলের সংজ্ঞায় ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার লিখেছেন : 'স্টাইল হল লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা অবচেতনভাবে নিয়োজিত সেইসব ভাষাগত উপায়, যে সবের দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগসাধন করেন' (পবিত্র সরকার, ২০০৬ : ৭২)। স্টাইল সম্পর্কিত ধারণাকে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যাখ্যার জন্য শৈলীবিজ্ঞান বা রীতি বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে। কোনো ভাষার ধ্বনি, শব্দ, বাক্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় এর মাধ্যমে এবং এই বিজ্ঞান লেখকের লিখিত ও কথিত বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে, যার মাধ্যমে লেখকের স্বতন্ত্র মনোভাব নির্ধারণ করা যায়।

লেখকের শিক্ষা-দীক্ষা, অর্জিত জ্ঞান ও সংস্কার লেখার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে। এছাড়া পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট লেখকের বিষয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলে। যা শৈলীর পরিবর্তন ঘটায়। আবার মানুষের ঘটনার আবর্তে যে সব শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়, তার উপরে শৈলীর ধরন নির্ভর করে। লক্ষ করলে দেখা যায়, সামাজিক সমস্যা, রোমান্টিক প্রেম কাহিনি অথবা প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষা তথা শৈলীর প্রয়োগ হয় আলাদাভাবে। সেজন্য উপন্যাস, ছোটগল্প এবং কবিতার শৈলীতে পার্থক্য দেখা যায়। পবিত্র সরকারও এ বিষয়ে একই মত পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্য :

> প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব রচনালক্ষণ কিছু থাকে। ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, প্যারাগ্রাফ বা স্তবক রচনা, রচনার আরম্ভ ও উপসংহার ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে সেই লক্ষণগুলি ধরা পড়ে। যে যেভাবেই দেখুন রচনা রীতির মধ্যে খানিকটা identific ব্যাপার আছে, অর্থাৎ তা লেখককে কোন না কোনভাবে চিনিয়ে দেয়। (পবিত্র সরকার, ২০০৬ : ৭৪)

তবে লেখক যে কোনো প্রেক্ষাপট বা উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য রচনা করেন না কেন, এর একটি নির্দিষ্ট গঠনগত দিক বিদ্যমান। সাহিত্যের এই গঠনগত দিককে ভাষাবিজ্ঞানে 'Content' (আধেয়) এবং 'Form' (আধার) বলে। লেখক তাঁর সৃজনশীলতার মাধ্যমে এর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন, যেখানে লেখায় সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। ভাষা লাভ করে ভাবানুগ রূপ। এই রূপ বা শৈলী যদি ভাবানুসারী না হয়, তবে তা ব্যর্থ হয়। সার্থক লেখার প্রয়োজনে লেখকের ভাব ও শৈলীর সম্মিলন ঘটাতে হয়। কারণ :

> ভাষা তার প্রকাশরূপে হয়ে উঠতে পারে বয়ানের ভাববস্তুর (content of a text) প্রতিফলক কিংবা প্রয়োজনানুসারে ভাবরূপের বিবর্ধক। জেফারসনের মতে, রচনার ভাববস্তুর কোনো বিশিষ্ট লক্ষণের সঙ্গে রচনার ভাষাগত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ নির্মাণ করাই প্রকাশরূপের স্তরে শৈলীবিজ্ঞানের লক্ষ্য। (অভিজিৎ, ২০১৬ : ১৫)

তবে যান্ত্রিকভাবে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদের সমাবেশ ঘটালেই রচনা সার্থক হয়ে ওঠে না। বরং সহজ, সরল, সংক্ষেপ ও স্পষ্ট করে প্রয়োজনীয় তথ্য, সংবাদ বা জ্ঞান পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই গদ্যরীতি সার্থক হয়ে ওঠে। সংক্ষেপ কিন্তু স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ– বক্তব্যকে এমনভাবে উপস্থাপন সহজ বিষয় নয়। এর জন্য একজন লেখককে অধ্যবসায় করতে হয়। একজন সাহিত্যিকের উপস্থাপিত বক্তব্য এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে তাঁকে স্কুল মাস্টার অথবা ধর্মগুরু মনে না হয়। এই রীতি একজন লেখককে সাধনার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। হরপ্রসাদ মিত্রের মতে :

> নিজের স্টাইলের চাই বিশেষ অনুশীলন। স্টাইলের বিষয়ে অর্থাৎ কোন কথা কীভাবে লেখা উচিত সে সম্পর্কে সর্ব প্রথমে দরকার বিষয়বস্তুর ভাবনা, তারপর আছে শব্দ বাছাইয়ের কাজ, তারপর দুতরফের ওজন দেখতে হবে। অতঃপর সৌষ্ঠবের দিকে নজর রেখে বস্তু বাক্য ও শব্দের যথোচিত বিন্যাস ঘটানো চাই। আন্তরিক পরিশ্রমের সঙ্গে এ বিষয়ে ঘন ঘন অভ্যাসের দরকার। (হরপ্রসাদ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ : ৩২)

লেখককে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ লেখা উপস্থাপনের জন্য, তাঁর রচনার প্রত্যেকটি শব্দ, সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য অনুচ্ছেদসহ প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তবেই তাঁর শৈলী বিশিষ্টতা অর্জন করে। কারণ 'স্টাইল বিচারে রচনার প্রতিটি শব্দ, সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য, অনুচ্ছেদ সমস্ত এমনকি প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ জাত ধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জ সমস্তই অতিসূক্ষ্ম ও সতর্ক বিশ্লেষণীয়। চিত্রকল্প, ভাষণ, কলা সব জড়িয়ে স্টাইল' (নবেন্দু, ১৯৯০ : ২৭)।

মূলত সাহিত্যকর্ম হলো একটি শাব্দিক অবয়ব। তাই বলা যায়, সাহিত্যের ভাষাই শৈলীবিজ্ঞানের মূল উপজীব্য এবং লেখকের সুষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এ সম্পর্কিত আলোচনাটি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। শৈলীবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষাবিশ্লেষণের মাধ্যমে তার স্বকীয়তার বিকাশ ঘটায়। এই প্রবন্ধে শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে দ্যতিয়েনের গদ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো :

> ফাদার দ্যতিয়েন এক চমকপ্রদ, অত্যাধুনিক ও সরস বাংলা গদ্যের শৈলী উদ্ভাবন করেছেন। যে গদ্য অনুপম শব্দ ও বাক্যের যোজনায় গঠিত। তাঁর বক্তব্য সাবলীল, মনোজ্ঞ ও ধারালো। যেহেতু তিনি ছিলেন ফরাসিভাষি। তাই তাঁর লেখায় দেশি ও বিদেশি ভাষার সংমিশ্রণে মনোরম গদ্যের মাধুর্য লক্ষ করা যায়। আসলে 'একজন মানুষের 'গদ্যশৈলী' কথাটা শুনতে যত সহজ, আসলে তত সহজ নয়। (বিভাবসু, ২০১৪ : ভূমিকা)

তবুও শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে লেখকের শৈলীর একটি অবয়ব অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়।

ষাটের দশক থেকে ফাদার দ্যতিয়েন লিখতে শুরু করেন এবং সত্তরের দশকে তাঁর গদ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। 'প্রমথ চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন, গদ্যরচনাও আর্ট, তা যত্নসাধ্য, সাধনাসাপেক্ষ' (অরুণকুমার, ২০০৩ : ৭৫)। ফাদার দ্যতিয়েনও সময়ের আবর্তে সাধনায় তাঁর গদ্যে শিল্পরূপ আনয়ন করেন, যেখানে প্রকাশ পায় জীবনের নিত্যকার প্রতিচ্ছবি। যখন তিনি লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর লেখা গল্পগুলির ভিতরে ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ পেলেও পরবর্তীকালের লেখায় বাঙালি জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাঙালি সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ ও প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্নার কথায় তাঁর লেখা অগ্রসর হয়েছে। চিন্ময় গুহ এ বিষয়ে মন্তব্য করেন :

> এক শুভ্রত্বক বিদেশির কলম থেকে ঝড়ে পড়ছে মধু, আর তা গড়িয়ে পড়ছে আমাদের জীর্ণ পাতার ওপর। আর আমরা আপ্লুত হয়ে গিয়েছি, কারণ এ তো আমাদের জন্মজন্মান্তরের, অবচেতনের ভাষা, যা কাদা-মাটি-পাথর খুঁড়ে বের করে আনছে ঝরনাজল। বাংলা ভাষার কয়েক শতাব্দীকে শুষে নিয়ে, তাকে কথ্যকথনের সঙ্গে মিশিয়ে একী অপরূপ প্রাণের ভাষা তৈরি করলেন ফাদার দ্যতিয়েন! আর তানপুরার তারের মতো তা আমাদের এই সোনালি দুপুরকে বাজিয়ে দিয়ে গেল! (ফাদার, ২০১২ : ৬৬৭)

প্রাচীন থেকে তৎকালীন সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের নিবিড় চর্চা করেছেন দ্যতিয়েন। তাই বাংলা সাহিত্যের পর্যায়ক্রমিক ধারার খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর অবগত ছিল। পাশাপাশি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বোধ তাঁর ভিতরে এক ছন্দের সৃষ্টি করে। এই দুই সুরের মেলবন্ধনে তাঁর গদ্য এক বর্ণিল ঝরনাধারার মতো প্রবাহিত। দার্শনিক ও ভারতবিদ ফাদার পিয়ের জোহানসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্ভারের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। তাঁর প্রেরণায় *শকুন্তলা*, *মেঘদূত*, *রত্নাবলী*, *উত্তর-রামচরিত* প্রভৃতি রচনা দ্যতিয়েনের গোচরে আসে। এছাড়াও জেডি অ্যান্ডারসনের বাংলা ভাষার ম্যানুয়েলে *মেজদিদি*, *নৌকাডুবি*, *স্বর্ণলতা*, *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর উদ্ধৃতি, রবীন্দ্রনাথের 'আজি ঝড়ের রাতে', 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' প্রভৃতি তিনি পড়েছিলেন। দ্যতিয়েনের ভাষায় : 'অ্যান্ডারসনের পাঠ্যপুস্তকেই বাংলা সাহিত্যের অন্দরে আমার প্রথম পদক্ষেপ' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৯৬)।

লেখার শৈলীর বিষয়ে দ্যতিয়েন ছিলেন খুঁতখুঁতে। ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাক্যে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করতেন। তিনি মনে করতেন, লেখায় শিল্পের তাৎপর্য আনতে শব্দের যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। কখনো কখনো গোটা এক সপ্তাহ ধরে তিনি মাত্র এক

পৃষ্ঠা লিখতেন। তারপরও তিনি লেখার শেষ অবস্থাটা নিয়ে কখনো পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তাঁর পরিচিতজন ও বন্ধুদের তিনি অকপটে জানিয়েছেন, সঠিক গদ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কলম থেকে বের হয়নি। বারবার পরিবর্তন-পরিমার্জন করে তিনি পছন্দমতো গদ্য সাজাতেন।

সাহিত্যে লেখক যে শৈলী নির্বাচন করেন তা লেখকের নিজস্ব নির্বাচন। একে প্রভাবিত করে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। রচনার বিষয়, লেখকের উদ্দেশ্য, সময়কাল এবং সেই সময়ে অন্যান্য লেখকের ব্যবহৃত শৈলীর প্রভাবের উপর গদ্যের শৈলী নির্ভর করে। দ্যতিয়েনের গদ্যলেখার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেন :

> বাংলাভাষার নিষ্ঠ সেবক দ্যতিয়েন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, একটি বাক্য রচনার পর পরিপূর্ণ তৃপ্তি না আসা পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় বাক্যটি লেখেন না। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের প্রতি তাঁর আবেগ এবং সচেতনতা কাজ করে। তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দের মেলবন্ধনে বাক্যে কোনো আড়ষ্টতা এলো কিনা, বা লেখায় ছন্দস্পন্দন বজায় আছে কিনা, এসব দেখতে-দেখতে তাঁর গদ্য অগ্রসর হয়। লালিত্য, প্রসাদগুণ, সরসতা আর বুদ্ধির দীপ্তির মিলিত প্রবাহ তাঁর গদ্য। (মলয়চন্দন, ২০১৬ : ৩)

ভালোবেসেই বাংলা পড়তে শুরু করেছিলেন এবং আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন এই ভাষাকে। বাংলা গদ্যের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের তৎসমময় বাক্যবিন্যাস তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। লেখক হবেন, ভাবেননি তিনি। কথা বলতে ভালোবাসতেন। আড্ডা জমাতেন– ক্ষিতীশ রায়, অশোকবিজয় রাহা, শান্তিদেব ঘোষ, রামকিঙ্কর বেইজ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী আর ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে। তাঁর আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন অবাঙালি বান্ধবীরা, ওমর খৈয়ামের অনুবাদক কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী ত্রতা ঘোষ, অন্নদাশঙ্করের মার্কিন স্ত্রী লীলা রায় সহ যামিনী রায়, অরুণ মিত্র, মৈত্রেয়ী দেবী, সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো সংস্কৃতিজনরা। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ফাদার দ্যতিয়েনকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছেন :

> I thank you for drawing out some of the hidden powers of my mother tongue in such a beautiful and convincing way, that Bengali is such an expressive language is once again demonstrated by your perfect little notes and observations. (দ্যতিয়েন, ২০১২: ৬৭৭)

দ্যতিয়েনের গদ্য পর্যালোচনায় লক্ষ করা যায়, তাঁর রচনা অনেকটা ডায়েরি বা দিনপঞ্জির আদলে রচিত। তবে লেখাগুলো পুরোপুরি ডায়েরির মতো নয়। কারণ 'ডায়েরি বলতে আমরা বুঝি দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা খুঁটিনাটি বিষয়কে সাহিত্যমণ্ডিত ভাষায় উপস্থাপন করা এমন শিল্প মাধ্যম, যেখানে লেখকের রম্যতাযুক্ত সাংবাদিকসুলভ আত্মকাহিনির প্রকাশ ঘটে' (উজ্জ্বল, ১৯৯৯ : ২৯০)। দ্যতিয়েনের রচনাশৈলীতে এর প্রভাব লক্ষ করা গেলেও দিনলিপি বা ডায়েরি লেখার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম এখানে মানা হয়নি। ডায়েরি লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সাল ও তারিখের ব্যবহার যা দ্যতিয়েনের লেখায় অনুপস্থিত। তবে, ডায়েরি বা দিনপঞ্জির উত্তম পুরুষে লেখার বৈশিষ্ট্যটি দ্যতিয়েনের লেখায় রয়েছে। কল্পনা মিশ্রিত ভাষায় বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সাধারণ কথার সমাহারে রচনাগুলোর সৃষ্টি, যেখানে বক্তা লেখক নিজে। তিনি উল্লেখ করেন 'ডায়েরি বলুন, রোজনামচা বলুন, দিনপঞ্জি বলুন, আমার এই যাবতীয় রম্যকাহিনি কল্পনামিশ্রিত আত্মকথা, উত্তম-পুরুষে রচিত' (দ্যতিয়েন, ২০১৩ : ভূমিকা)। তিনি বঙ্গদেশে অতিবাহিত সময়ের বর্ণনা সাহিত্যসুলভ ভাষায় রচনা করেছেন। যেমন :

> ভীষণ মাথা ধরেছিল সেদিন; পড়াশোনায় একটুও মন বসছিল না। লিখতে বসলাম 'ডায়েরির ছেড়াঁ পাতা'। লেখাটার উপর চোখ বুলিয়ে অমিতাভ রসজ্ঞতাদ্যোতক ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, "খাসা! ছাপিয়ে দিন 'দেশ' পত্রিকায়।" আমার কপাল ভাল সম্পাদক মশাই ফেরত পাঠালেন না। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ০৮)

শব্দ প্রয়োগ : দ্যতিয়েন তাঁর রচনায় শব্দের ব্যবহারে যে সার্থকতা দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবিদার। গতানুগতিকতা থেকে তিনি ভাষাকে বের করে এনেছেন। সমার্থক শব্দকে নানাভাবে প্রয়োগ করে এর মধ্যে গতিশীলতা এনেছেন। এতে কেবল যে তাঁর ভাষাদক্ষতারই পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, একইসঙ্গে একটি বিদেশি ভাষা ব্যবহারে তাঁর সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসেরও পরিচয় মেলে। কারণ :

> রচনাশৈলীর সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে গতানুগতিক না হয়েও এর স্বচ্ছতা। প্রাত্যহিক ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে গঠিত রচনাশৈলীই সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট, কিন্তু এর ব্যবহার গতানুগতিক হতে পারে... ধার করা শব্দের ব্যবহার বর্বরতায় পর্যবসিত হয়। যেটা প্রয়োজন তা হলো বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ। কারণ এক ধরনের শব্দ ব্যবহারে ভাষা নিচুতা ও গতানুগতিকতা থেকে রক্ষা পায়। এগুলো হলো অপ্রচলিত শব্দ, রূপক, শব্দালঙ্কার এবং অন্যান্য বিষয়... আবার অন্যদিকে প্রচলিত শব্দের ব্যবহার রচনায় স্বচ্ছতা দান করে। (বদিউর, ২০১৫ : ১৩৪-১৩৫)

একটি সাহিত্য সৃষ্টিতে যে অভিলক্ষ্য থাকে তা প্রকাশিত হয় উপযুক্ত শব্দ নির্ধারণের মাধ্যমে। এর গভীরতাও ভাষার মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়। ভাবের অন্তর্বস্তুকে ধারণ করার জন্য নির্ধারিত শব্দ প্রয়োগ করার স্বাধীনতা একমাত্র লেখকেরই থাকে। যে কোনো গদ্য সাহিত্য নির্মাণে শব্দ ও ভাষার যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর। ভাষা ব্যবহারের কৌশলের উপরই লেখক, স্থান ও সময়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই লেখক মাত্রই ভাষা সম্পর্কে সচেতন থাকেন। পবিত্র সরকার গদ্যে শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন :

> ভাষার ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারের পরিবোধ সব লেখকের ক্ষেত্রে থাকে না । একে শিখে নিতে হয়। ভালো বাংলা লিখতে হলে বাংলাভাষী মানুষেরও বাংলা শিখতে হয়। তবে এই বাংলা কেমন বাংলা সে বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা না থাকলে বুঝে ওঠা মুশকিল। ...অকারণে দুর্বোধ্য কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে বাংলা লেখার কোনো অর্থ হয় না। ...কঠিন হলেও সেই শব্দ ব্যবহার করবে যার অর্থ মোটামুটি বোঝা যায়, একেবারে অপ্রচলিত নয়, যা হঠাৎ সামনে এস আমাদের চমকে বা ঘাবড়ে দেবে না। (পবিত্র, ২০১২ : ৩০)

ফাদার দ্যতিয়েনও এক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি ভাব, সময় ও স্থান অনুসারে শব্দ প্রয়োগ করতেন। পশ্চিমবঙ্গের জীবনকথা উপস্থাপনে তিনি যে শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করেছেন, ঢাকার প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনে ভিন্ন শব্দ সম্ভার প্রয়োগ করেছেন। 'সুন্দর শৈলীর একটা মূল কথা এই শিষ্ট ও সুন্দর শব্দ বাছাই করে আনা। কঠিন শব্দ নয়, সুন্দর শব্দ।... যে শব্দ লেখার মধ্যে স্বচ্ছন্দ আর স্বাভাবিক মনে হবে না, সে শব্দকে লেখায় আনতে নেই' (পবিত্র, ২০১২ : ৩২)। দ্যতিয়েন লেখার ক্ষেত্রে সবসময় এই বিষয়টি মেনে চলেছেন। শব্দ প্রয়োগে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। তৎসম, তদ্ভব শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে 'শ্যামপুকুরের' তেলিপাড়ার বাংলা শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তেমনি প্রান্তিক গ্রামাঞ্চল বাসন্তীতে শিক্ষকতার সুবাদে গ্রাম-বাংলার ভাষা প্রয়োগে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দ। ফলে তাঁর রচনায় এই দেশি শব্দের ছিল অনায়াস যাতায়াত। অযথা কোনো বিদেশি শব্দের প্রয়োগে ভাষাকে ক্লিষ্ট করেননি। আবার ছন্দের প্রয়োজনে যখন কোনো বিদেশি শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে, তখন তা অত্যন্ত সচেতনভাবে করেছেন। তাঁর শব্দযোজনার ব্যবহার প্রশংসনীয়– তৎসম শব্দের ব্যবহার করতে তিনি পছন্দ করতেন। যেমন– 'অঞ্জনার সমস্যা : দেহশীর্ণতা, আরতির ভাবনা চর্মশ্যামত্ব (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৯০)। আবার 'মুখবন্ধ'

লেখায় তিনি লিখেছেন– 'পাছে লোকে বলে তাঁর বইটি এক নিরূপায় ইংরেজ-বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ, এক মর্মাহত স্বাজাত্যাভিমানের অক্ষম ক্রন্দন ও দিবাস্বপ্ন' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৯০)। তিনি শব্দের প্রয়োগ করেছেন সামঞ্জস্য রক্ষা করে :

> আজকালকার দিনে দেখি আধুনিক পরিচালকের অ্যান্টিফিলম, আধুনিক শিল্পীর অ্যান্টিচিত্র... সেদিন কুমোরটুলির মন্টু আমার গোটা কতক স্বরচিত কবিতা শোনাতে এসেছিল– কিস্‌সু বুঝিনি; ঢোঁক গিলে "লাইনগুলোর মানে কী?" জিজ্ঞেস করতেই, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভারিক্কি গলায় সে বলল, "জানেন না বুঝি? এগুলো অ্যান্টি-পোয়েট্রি। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪১)

আর হিন্দি শব্দের অনায়াস উপস্থাপন– 'আমি কি তোমাদের মায়া মাঙব বলে এই পৃথিবীতে জন্মেছি' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪১)। মুসলমানি সংস্কৃতির ভাবব্যঞ্জনায় তিনি আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'যাবতীয় মখলুকাত যিনি পয়দা করেছেন, আশমানে জমিনে যাঁর শরিক নেই' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৫৫৪)।

দ্যতিয়েনের গদ্য তৎসম শব্দবহুল হলেও, প্রয়োগের সার্থকতায় তা হয়ে উঠত সাবলীল ও ছন্দময়। 'বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন' এর উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক :

> বিলেত থেকে তিনি নববধূকে দু'বছর ধরে যে সমস্ত পত্র প্রেরণ করেছেন, সেগুলি পত্রগ্রাহিকার অনুমতিক্রমে, ইন্দ্রিরা দেবীর অক্লান্ত প্রযত্নে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনটি নিবিষ্ট চিত্তে পঠন করেছি, প্রথমে সসঙ্কোচে, ক্রমে ক্রমে সসম্ভ্রমে, কৌতূহল মিশ্রিত ঔৎসুক্যে। সত্যেন্দ্রনাথ শিশু ভার্যাকে 'জ্ঞেনোদ' কিংবা 'ভাই জ্ঞানদ' অথবা 'ভাই বর্জিনি' সম্বোধন করেছেন। বর্জিনি কথাটা প্রসিদ্ধ এক ফরাসি উপন্যাসের নয়িকার নাম। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪৮)

ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্যতিয়েন রম্যরচনার ধরন ব্যবহার করেছেন। বাক্যবিন্যাসে সরসতা তাঁর রচনার মূল বৈশিষ্ট্য। ছোটো ছোটো পরিসরে, সরল ও আটপৌরে শব্দের সমন্বয়ে তার সৃষ্টি হাস্যরসে পরিপূর্ণ। অর্জিত অভিজ্ঞতার বর্ণনার কৌশলে রয়েছে রম্যতা। 'নবাগন্তুক' রচনায় লক্ষ করা যায় :

> আমার গরীবখানায় চৌকাঠে কোনও নবাগন্তুকের পদধূলি পড়া মাত্র ক্যালেন্ডারের পাতা দেখে আমি বুঝে নিই, কেন এই শুভাগমন। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফল যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তবে, তবে মিশনারি স্কুলে চাকরির জন্য উমেদারি; আর যদি বিদ্যালয়ের বর্ষ শুরুর পালা আসন্ন, মিশনারি স্কুলে ভরতির জন্য ঝুলোঝুলি। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪৫)

অশ্লীলতা বর্জিত শব্দ ব্যবহার করেও সমাজের অন্ধকার দিকটির চিত্র স্পষ্ট উপস্থাপন সম্ভব, তা লক্ষ করা যায় দ্যতিয়েনের 'অঞ্জুর বাৎসরিক পত্র' রচনায়। এখানে অঞ্জুর জন্ম বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে যেভাবে :

> ওর নাম অঞ্জু। পদবি নেই। বাপ কে জানা যায়নি। বড় সিস্টার অঞ্জুর জীবনচরিত বাতলাতে লাগলেন। একদিন, গোধূলিলগ্নে, অপরিচিত এক যুবতী কনভেন্টের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে নবজাত এক শিশুকে সিস্টারদের হস্তে সমর্পণ করে জানিয়েছিল, বাড়িতে ওর আরও দু'টি বাচ্চা আছে। ওর স্বামী? সে নিরুদ্দেশ, একযুগ হয়েছে বউকে ত্যাগ করেছে। না অপদার্থ জীবটা অঞ্জুর বাপ নয়। তা হলে বাছাধনের জন্মদাতা কে? বেচারি মা কী করে জানবে বলুন? মণ্ডল মিস্ত্রির মেজো ছেলে, পাঁচু মিয়াঁর ছোটভাই... আধ ডজন বখাটে মিনসে পিতৃত্বের দাবি করতে পারে। অবশ্য কেউই তা করবে না। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৭২)

'আরবি-ফার্সি শব্দের সাবলীল ব্যবহার তাঁর গদ্যশৈলীতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 'খেলাধুলা, হিজিবিজি গল্প, মজার গান। সেই অতিরিক্তটুকু নিষ্পাদনের জন্য স্থায়ী লোকদের সময় কুলোয় না, বাইরে থেকে আদমি আনতে হয়' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৭০)।

গদ্যে তিনি অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করে যে ভাব প্রকাশ করেছেন তাতে শব্দ নির্বাচনের গণ্ডি বেড়েছে কিন্তু পাঠকের ভাব অনুধাবনে অসুবিধে হয়নি। প্রচলিত শব্দ 'কুকুরে'র পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন 'সারমেয়'। তাঁর রচনায় : 'জন্তুজাতির সাঙ্গে বাঙালির খুব একটা বনে না। সারমেয় ওদের চক্ষুশূল, আত্মসংযমরহিত বলে। মনে রাখবেন, সারমেয় ব্রাহ্মণহন্তার জন্মান্তরিত জীব' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৯৬)।

প্রেক্ষাপট বর্ণনায় শব্দ ও ভাষার যে সম্মিলন তিনি ঘটিয়েছেন, তা এক বাক্যে বলতে হয়, অসাধারণ। ঘরোয়া ভঙ্গীতে, সুকৌশলে শব্দ প্রয়োগের খেলায় পাঠকের হৃদয়কে তিনি গভীরভাবে ছুঁয়ে গেছেন। 'বঙ্গের আম ও অস্থি' রচনার অংশবিশেষ থেকে এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়–

> দেশোৎপন্ন আপেল আর কুল, আমদানি করা কলা, কমলা আর –মতিভ্রম মোটেই নয়– পেরুদেশীয় আম। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের হিমসাগর, ফজলি, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, আলফোন্সোর মতো সুস্বাদু নয়, আম তো বটে। প্রলোভন সামলাতে পারিনি, কিনে ফেললাম এক হালি (চারটে)। বাড়ি ফিরে চিবোতে লাগলাম, ...বিদেশ প্রবাসী বাঙালি কি নিঃসঙ্গ ঘরে বসে ওই ভারতীয় ফলটিকে ভক্ষণ করে আনন্দ পায়? পায় না। তবে বলি, সানন্দে খেয়েছি আমি। বঙ্গীয় সাহচর্যের অভাবে, বঙ্গীয় সঙ্গীতের সঙ্গতে : 'ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে...। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৫-৩৬)।

বাক্য গঠন : ফাদার দ্যতিয়েন বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখিয়েছেন। লক্ষ করা যায় 'বাংলা বাক্যে সাধারণভাবে ক্রিয়াপদ শেষে আসে, সেই অনুযায়ী বাংলাভাষার ভাষাবিজ্ঞানগত চরিত্র হলো SOV, অর্থাৎ Subject-Object-Verb' (পবিত্র, ২০১৯ : ২২)। দ্যতিয়েন তাঁর গদ্যে মাঝে মাঝে ক্রিয়াপদের ব্যবহার উদ্দেশ্যের (Subject) আগে করেছেন। যেমন :

ক. ভুল বুঝবেন না। আমি সেদিন ফলের সন্ধানে বেরোইনি। বেরিয়েছিলাম মোজা কিনতে। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৪)
খ. প্রলোভন সামলাতে পারিনি, কিনে ফেললাম এক হালি (চারটে)। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৫)

সমাপিকা ক্রিয়াকে উহ্য রাখা বাংলা ভাষা ব্যবহারের একটি রীতি। দ্যতিয়েনও এই রীতি অনুসরণে বাক্য রচনা করেছেন।

ক. ওরা অবশ্য আজ টাক-পড়া দাদামশায়, শুভ্রকেশা মাতামহী। (স. ক্রি. ছিলেন) (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ০৭)
খ. মানি, আমার এই বন্ধুসকল আজ সাহিত্যচর্চা-বর্জিত। (স. ক্রি. ছিল) (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৪)

অনেক সময় বাক্যে কর্তাটি উহ্য রাখা হয়; প্রথমে কর্ম তারপর ক্রিয়া। অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে এ ধরনের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। দ্যতিয়েনের গদ্যেও এই ধরনের বাক্য লক্ষ করা যায়–

ক. শাঁখ বাজল, বাশিঁ বাজল, পটকা ফাটল, মাইক ক্রি—ক করল, পরদা খুলল না। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৮৫)
খ. মনে মনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতার প্রতিতুলনায়। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৮৯)
গ. ধীরে ধীরে শিখে উঠেছি। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৮৯)

যতিচিহ্নের ব্যবহার : ছেদ ও যতি চিহ্নের সুচারু ব্যবহার দ্যতিয়েন আয়ত্ত করেছিলেন নিখুঁতভাবে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতো তিনি সুদীর্ঘ বাক্যে ভাব প্রকাশ করেছেন 'আল্লাহু আকবার' রচনায়। দীর্ঘ একটি বাক্যে তিনি ভাব প্রকাশ করেছেন অনায়াসে :

> আমাদের এই উত্তর কলকাতায়— তেলিপাড়ায় এই নিবিড় পল্লিতে— মর্ত্যবাসীর জাগরণপর্ব মৃদু-মন্থর ক্রমবর্ধমান। বিশ্লেষণ করে দেখবেন, আপনার স্বপ্নমালার রঙিন সূত্র ছিঁড়ে যায় শৈবালদের গৃহশীর্ষবাসী কুঁকড়োর আত্মঘোষণায়, আড়মোড়ার পালা চুকে যায় পার্শ্ববর্তী খাটালের গোরু-মোষের ঐকতানে... তারপর গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় বর্ণিত রীতি অনুযায়ী দক্ষিণ চরণ মাটিতে ফেলে দেওয়ালে টাঙ্গানো মাতৃদেবীর, পিতৃদেবের তথা তাবৎ তাবৎ পূজ্য নমস্যদের প্রতিকৃতির দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ বোলালেন নীচের তলায় স্বর্গস্থ গোপালের মন্দিরে-কর্মরতা পার্থিব গোপালের মায়ের ধোয়া-মোছার তালে তালে; অবশেষে, প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনার্থে স্নানাগার অভিমুখে আপনি যেই পা বাড়াবেন, বুঝবেন, হরিসভার গায়েন-বায়েনের সম্মিলিত "হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—কীর্তন মন্দিরের চত্বর কাঁপিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জাগিয়ে তুলেছেন। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৫৮৭)

বাগ্‌ধারার ও প্রবাদ প্রবচন : গদ্যে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে তিনি বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার করেছেন। 'জাকির মিঞার আস্তানা'য় রচনায়– 'মুনশি শেখ মহম্মদ জাকির মিঞার চৌকাঠ পেরোতেই বুঝলাম, বিস্মিল্লায় গলদ!' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৫৫৪) 'ডাকযোগে পরিচয়' রচনায় প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— 'রিঙ্কু ও বর্ষারা একই বাড়িতে ভাড়াটে, দু'জনে ঘোষণা করল– সাবধানের মার নেই!' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪৯১)

চিত্রকল্প ও উপমা : ভাব ও ভাষার সম্মিলনে গদ্যের প্রকাশভঙ্গিতে তিনি ছিলেন অনন্য। এ ক্ষেত্রে তিনি উপমার ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সুন্দর ও রুচিশীল উপস্থাপনে। যেমন :

ক. তঁ্যাত্যাঁ-র অ্যালবামগুলির সংলাপসমূহ আমাদের কণ্ঠস্থপ্রায়। ওর মধ্যে নতুন কিছু আমদানি করলে, আমাদের কর্ণে-নয়নে খটকা লাগে— যেমন কর্কশ লাগেই অন্নগ্রাসে কাঁকর। ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝবেন, ওই অন্ন-কাঁকরের সহাবস্থান মুড়ি-মুড়কির মতো সুমধুর নয়। (দ্যতিয়েন, ২০১৩ : ৬৩)

খ. য়ুরোপীয়েরা এদেশের খাদ্য খেয়ে উচ্চও ঔদরিক তৃপ্তি লাভ করতে পারবে বটে। আপত্তি শুধু এই বৈচিত্র্যেও বড় অভাব: জলন্ত অঙ্গারই বলুন আর জলদঙ্গারই বলুন, গ্রাসে গ্রাসে মনে হয় আগুন গিলছি.. ঝালে সাহেব নাজেহাল। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৭)

গ. কে তোমাদের বলেছিল আমাকে কুড়োতে? তোমাদের আর ছেলে ছিল না বুঝি যে আমাকে পুষতে গেলে রাস্তার ল্যাংড়া কুকুরের মতো? (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪৯৮)

দ্যতিয়েন চিত্রকল্পের রসাত্মক বর্ণনায় বিষয়ের প্রকাশ করেছেন। পরিহাস সুলভ সরসতায় শীলাদেবী নামক জনৈক ব্যক্তির আলমারি ভর্তি গজপতির সংগ্রহকে তিনি যে বাধ্য হয়ে সংরক্ষণ করেছেন তারই কথামালা :

> শীলাদেবীর আস্তানায় প্রবেশমাত্রই সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে কাচের আলমারিতে সংরক্ষিত বহুরূপী গজপতির এক সংগ্রহ। স্ফটিক, মর্মরপ্রস্তর এবং চন্দন-কাষ্ঠের উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান, ঝুলন্ত কিংবা বামমুখী শুঁড়ে মণ্ডিত। অধিকাংশ মূর্তিগুলি উপঢৌকনরূপে প্রাপ্ত। দানকারীদের ধীশক্তি পরিমাপ করুন। দেবতার প্রতিকৃতির অপসারণ নিষিদ্ধ। অতএব উপকৃত ব্যক্তি বাধ্যতাবশতই উপহারটিকে সযত্নে রক্ষা করবেন। (দ্যতিয়েন, ২০১৩ : ০৭)

ভাব প্রকাশের অনন্যতা : সঠিক শব্দচয়নে ভাব প্রকাশের যে পারদর্শিতা তাতেও দ্যতিয়েনের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ও বাংলাদেশের জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে যে পার্থক্য, তা শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ বঙ্গ সুন্দরবনের যাপিত জীবনের নানা প্রতিচ্ছবির যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাবলীল শব্দ ব্যবহারের দক্ষতায়। *ডায়েরির ছেঁড়া পাতা*, *সাদাসিধে খসড়া*, *আটপৌরে দিনপঞ্জি* গ্রন্থগুলির ভাষা, উপস্থাপিত সংস্কৃতি, শব্দচয়ন, বাক্যের ধরনে তৎকালীন সময়ের ভারতবর্ষের চিত্র

প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু *রোজনামচার* অবয়বে ফুটে উঠেছে সমগ্র বাংলাদেশ। ঘটনার বর্ণনায়, ভাষার গঠনে, বাক্য বিন্যাসে ও শব্দ চয়নে বাংলাদেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সংস্কৃতির চিত্র প্রস্ফুটিত। *আবার লালপেড়ে গল্পাবলিতে* প্রকাশ পেয়েছে ধর্মীয় ভাবধারা। তাঁর রচিত গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি থেকে এ সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

ডায়েরির ছেঁড়া পাতায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের চিত্র

> কুনালকে, বলতে গেলে আমি প্রায় ওর জন্ম থেকেই চিনি। ওর দাদামশায় ও ঠাকুরদা দু'জনের সঙ্গেই আমার অনেক দিনের আলাপ; ওর বাবা-মা'র বিয়ের দিনে সনাতনী অনুষ্ঠানের পর দু'জনেরই অনুরোধে নবদম্পতিকে আমি আশীর্বাদ করেছিলাম। গিয়েছিলাম কুনালের দিদিমার শ্রাদ্ধে, গিয়েছিলাম কুনালের ফুলকাকার বউভাতে। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৭)

রোজনামচা গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট লক্ষ করা যায়

> পুব পল্লিতে মুমিনদের আস্তানা; এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে পোদ-টিয়ারেদের কুঁড়েঘর। পুব পল্লির প্রাণকেন্দ্রে জুম্মা মসজিদ; মসজিদের গা ঘেঁষে মাদ্রাসা। মাদ্রাসার মৌলবিই মসজিদের ইমাম। মসজিদে আজান দেন, অবৈতনিক শর্তে, বাশারের আব্বা। বাশারের আব্বা দৌলতমন নন; বাড়িতে মুরগি পুষে শহরে ডিম বেচে কোনওমতে সংসার চালান। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪৯৭)

লালপেড়ে গল্পাবলিতে রয়েছে ধর্মীয় ভাবধারা

> হে প্রভু, এই পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হয়েছি, মাঝে মাঝে পিছিয়েছি, হোঁচট খেয়ে পড়েছি, ক্লান্ত মনে রাস্তার ধারে বসেছি, থামি নি কিন্তু। প্রভু, আমার জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমার আধ্যাত্মিক জীবনের আয়-ব্যয়ের হিসেব কষে বুড়িয়েছি। যে পথে তোমার উদ্দেশ্যে চলেছি,... এই পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যর্থতা নিয়ে এসেছি আজ তোমার শ্রীচরণে- নিরাশ হয়ে, শূন্যহাতে ও রিক্তহৃদয়ে। (দ্যতিয়েন, ২০১৬ : ১৬)

গদ্যে ছন্দের ব্যবহার : শুধু কবিতা নয় গদ্যেরও ছন্দ রয়েছে। এই ছন্দ আমাদের মোহিত ও আন্দোলিত করে। পূর্বে গদ্যছন্দে কবিতা লেখা হলেও তা ছিল মূলত কবিতাই, কিন্তু গদ্যেও যে ছন্দের ব্যবহার সম্ভব, তা দেখিছেন দ্যতিয়েন। গদ্যের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে তিনি ছন্দময় গদ্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর রচনায়। *ডায়েরির ছেঁড়া পাতা* থেকে চয়িত অংশ দেখা যাক–

> কার্যস্থলের ঘন ঘন পরিবর্তনের কল্যাণে সত্যেন্দ্রনাথ বহুভাষাবিদ হয়ে উঠেছেন। গুজরাতি তিনি জানেন, মারাঠি পরীক্ষা দিয়েছেন, এবার কন্নড় শিখতে শুরু করেছেন। উপযুক্ত শিক্ষক পেলে, বিনোদন হিসেবে তিনি সেতার ও তবলা শিখবেন। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৫৩)

ছন্দের প্রয়োগে গদ্য যে আরও বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে, দ্যতিয়েনের রচনা তারই প্রকাশ। পদ্যের যেমন ছন্দের মাধুর্য আছে গদ্যেরও তেমনি। দ্যতিয়েন তাঁর রচনায় একটি শব্দের পর আরেকটি শব্দ বসিয়েছেন অর্থের সঙ্গে মিল রেখে এবং সুরের প্রাধান্যে। তিনি বলেন– "দূরদর্শন আর বেতারবাণীর প্রতি আমার কৌতূহল কম। এর মানে এই নয় যে, আমি গান শুনি না। গান শুনি বটে, তবে যে-গানের প্রতি আমি আকৃষ্ট, সে-গান বাহ্যিক কর্ণকে নয়, আন্তর শ্রবনেন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দেয়। ওর নামান্তর 'গদ্যছন্দ'। আমি গদ্যছন্দের অভিলাষী" (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৬৩)। তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায় :

> ক. ভদ্রলোকটি বাস করে স্বনামধন্য তালতলা লেনে। সস্ত্রীক, সপুত্রক, সকন্যক। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪৯৮)
>
> খ. ট্রামের ঝাঁকুনি, বাসের দুঃসাহসিক সর্পিল ড্রাইভ, ট্রেনের আশ্চর্যমলমওয়ালার অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে– চলবে চমৎকার। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৫০০)

গ. সে সময় আকস্মিক লোডশেডিং ঘটত ঘনঘন। বাতি নিভত, পাখা থামত, জামা ভিজত, শরীর ঘামত। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৬৬)

ঘ. আমার নাম? স্কুলের নাম মেরি, বাড়ির নাম মুনমুন। দিদার কাছে আমি বুড়ি, ছোড়দা কিন্তু পাগলি বলে আমায় খেপায়। নাকটা চ্যাপটা, বাবার মতো। জিবটা ছ্যাবলা, মায়ের মতো। আর কেশ? সংস্কৃত মাস্টারের ভাষায় অজানুলম্বিত। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৫৮)

ভাব প্রয়োগে ভাষার ব্যবহার : রচনাশৈলীতে বিষয়ভিত্তিক ভাষার প্রয়োগে ফাদার দ্যতিয়েন সচেতন ছিলেন। ভাব ও ভাষার সম্মিলনে ঘটনার বৈচিত্র্যময়তায় তিনি ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাঁর এই ভাষা প্রয়োগ যথাযথ ও সার্থক। কোনো ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি যে ভাষার ব্যবহার করেছেন, আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অন্য রীতি প্রয়োগ করেছেন এবং ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। দ্যতিয়েনের রচনার বিষয়ভিত্তিক কিছু উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রসঙ্গভেদে ভাষা প্রয়োগের উপস্থাপন রীতিটি স্পষ্ট করা হলো :

ঘটনা বর্ণনার ভাষা

গলির ওপরে নীলমণিদের বাড়ি। নীলমণির গলা নেই– এ কথাটি euphemism এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পৃথিবীতে এত লোক বোবা হয়ে জন্মায়– কিন্তু হায়, বিধাতা নীলমণিকে গলা দিলেন কেন? আর যদি বা তার গলা-দান একান্ত আবশ্যক ছিল, তা হলে কোন জন্মেও কোন অনাবিষ্কৃত পাপের জন্য এমন গলা তাকে দিলেন সৃষ্টিকর্তা? অথবা পাড়ার সমস্ত ভাড়াটে কালা হয়ে জন্মাল না কেন? (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪৮)

নিজের সম্পর্কে বর্ণনা

ফাদারগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল চতুর্থ জন্মদিনে। মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন গির্জায়; আমরা দু'জনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে জানিয়েছিলাম প্রার্থনা: চেয়েছিলাম দিদিমার আরোগ্য, পরিবারের শান্তি আর বিশ্বসংসারের সর্বকল্যাণ। তারপর ফাদারের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম, দরজায় কড়া নাড়লাম জন্মদিনের আশীর্বাদেও যাচক হয়ে। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ১৯)

রসাত্মক আত্মকথন

ক. সন্ধ্যায় সংঘমিত্রার হাওড়াস্থিত গৃহের বৈঠকখানায় চায়ের নিমন্ত্রণে আহূত হয়েছি। না চায়ের নয়, কফির। সুধী পাঠক নিশ্চয় ভুলে যাননি, ভদ্রতা পালনের ফ্যাসাদে না পড়লে আমি পারতপক্ষে চা খাই না। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪৩)

খ. পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন না-করেও উপলব্ধি করতে পারি, আমার অনার্য শ্বেত বদনের দিকে কৌতূহল অভিভূত অজস্র নেত্র দৃঢ়নিবদ্ধ। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৩৮)

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা

পিতার মৃত্যুর পর, ১৬২৭ সালে, সিংহাসনে চড়লেন শাহজাহান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চাকা গেল ঘুরে। পাঁচ বছরের মধ্যে হুগলির পর্তুগিজ বসতি অক্রমণ ও অধিকার করে নেন তিনি, হুগলির খ্রিস্টানেরা আগ্রাতেই কারারুদ্ধ হয়। পাদ্রিরা শাহজাহানকে অভিহিত করলেন 'খ্রিস্টানদের মারাত্মক শত্রু' বলে। দোষ অবশ্য অনেকটা হুগলির পর্তুগিজদেরই। তারা জবরদস্তি চালাত মুঘল প্রজাদের উপর, ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধত তাদের, ধর্মান্তরের জন্যও জুলুম চালাত...। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ২৬০)

আক্ষেপ প্রকাশের ভাষা

জ্যোতিষী মেয়েটিকে বলেছেন বাবার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে। মেয়েটি করেছেও তা-ই। বাবার প্রতি ওর আক্রোশ এই যে, মায়ের সঙ্গে উনি ভাল ব্যবহার করেন না। করার সুযোগও উনি পান কম: মা তো বেশিরভাগ সময় কাটান বাপের বাড়িতে। সেখানে শিখার দুই দাদু ও

আর দুই মাসির কাছে তিনি আদর পান। বরাবরই তিনি আদুরে মেয়ে ছিলেন, স্কুলে পড়েননি, তাঁর জন্য ওই বড়লোকের বাড়িতে গৃহশিক্ষক রাখা হয়েছিল। কিন্তু হায়, বিদুষী– আর সুন্দরী– হলে কী হবে, স্বামীর মনোমতো তিনি হতে পারেননি।' (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৫০৪)

ব্যঙ্গাত্মক গদ্যের প্রয়োগ

ভেবেছিলাম সাহেব-বর্জিত এই মুলুকে আমিই । একমাত্র যবনসন্তান। হঠাৎ দেখি আমার দিকে এগিয়ে আসছে শ্বেতাঙ্গ এক দম্পতি। আমার সানন্দে-প্রদত্ত অনুমতি নিয়ে, ওঁরা দেশজ এক দ্বিভাষী সহচরের মঙ্গলদায়ক সহকারিতায়, একটি রঙিন ফোটোর মারফতে আমাদের শিলনলগ্নকে, একটি রঙিন ফোটোর মারফতে আমাদের মিলনলগ্নকে চিরস্মরণীয় করে তুললেন। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪০)

রসাত্মক গদ্যের বর্ণনা

তস্করমহাশয় সমীপেষু, বিপদে পতিত সাহেবের ব্যাগটাকে অবাধে লুঠ করুন। কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মেহেরবানি করে পাসপোর্ট প্রমুখ দরকারি দলিলগুলো তাঁকে ফিরিয়ে দিন। চিরকৃতজ্ঞ থাকব। নমস্কারান্তে, বিরহ-বেদনাতুর বিনীত এক শ্বেতকার সেবক। আমার সেই বন্ধু নিশ্চয়ই গ্যাবার্ডিন খুলেছিলেন। আর তাতেই এই বিপত্তি। উনি বোধহয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক দৌড়-প্রতিযোগিতায় রীতিমতো কাপ পেতেন না! দুঃখের বিষয়, সকলের মিলে তোলা সেই ছবি ওঁর পারিবারিক অ্যালবামকে অলঙ্কৃত করবে না। চোর মহোদয় কি আর ক্যামেরাটি ফেরত দিয়েছেন? (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৪২)

বিশ্বজুড়ে বহু বিদেশি বাংলা ভাষা চর্চা করেছেন। উইলিয়াম কেরী[১], হানা ক্যাথেরিন ম্যুলেন্স[২], মার্টিন কেম্পশেন[৩], এলভিয়েতা ওয়াল্টার[৪], হানা রুথ টমসন[৫], উইলিয়াম রাদিচে[৬], কাজুও আজুমা[৭] তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তবে রচনার তুলনামূলক বিচারে দ্যতিয়েনকেই এগিয়ে রাখতে হয়। দ্যতিয়েন সহ কয়েকজন বিদেশির রচনার অংশবিশেষ তুলনা করে দেখা যাক–

উইলিয়াম কেরির রচিত উদ্ধৃতি–

এক রাজার অতি সুন্দরী কন্যা, কিন্তু সে হরিণী-বদনা জন্মিয়াছিল। রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি-ক্রমে বিবাহ হইবেক; স্বীকার কেহ করে না। এইমতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভা মধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। (কেরী, ১৯৭২ : ৩১)

দং ইউছেন লিখছেন–

উনিশশ বিংশ সালে শাংহাই খাই-দং প্রকাশনালয় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত করেছিল রবীন্দ্রনাথ বাংলা-ভাষার মহান কবি, চীনা জনগণের মাঝে তিনি প্রিয়তম কবি ও মহান বন্ধু। (মলয় চন্দন, ২০১৫ : ২০)

মার্টিন কেম্পশেন এর লেখা–

আমার মধ্যবিত্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাতাবরণ আমি ছেড়ে এসেছি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, এসেছি পৃথিবীকে জানার কৌতূহল নিয়ে। সেই অর্থে আমি বর্তমান প্রজন্মের জার্মান ছাত্রছাত্রীদের পথিকৃৎ। পাঠ্যসূচির অঙ্গ হিসেবে তাদের এখন পড়াশোনা বা কর্মজীবনের শুরুতে কয়েক মাস বা কয়েক বছর দেশের বাইরে কাটাতে হয়। (কেম্পশেন, ২০১৫ : ৩১)

দ্যতিয়েন লিখেছেন–

ভাবতে লাগলাম রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কথা। আর কোন দেশে এমন কবি জন্মেছেন। তিরোধানের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও প্রতিটি অনুষ্ঠানে যাঁর কবিতার আবৃত্তি অপরিহার্যভাবে অব্যাহত, দিদিমা হতে নাতনি পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরে যাঁর গানের অপ্রতিহত সমাদর। (দ্যতিয়েন, ২০১২ : ৭৪)

ফাদার পল দ্যতিয়েন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত-ঘেঁষা গুরুগম্ভীর তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ শব্দ এবং আরবি ও ফারসিসহ বিভিন্ন বিদেশগত শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ রূপটিকে তিনি তাঁর গদ্যে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষার শ্রুতিমাধুর্য ও গীতিময়তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল প্রবলভাবে। তাই তিনি এই ভাষায় এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে, এর শব্দ ব্যবহারে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট গদ্য হয়ে উঠেছে নতুন ও অভিনব। তৎসম-ঘেষা হয়েও দ্যতিয়েনের গদ্যে চলিত ভাষার সাবলীল ভঙ্গিটি প্রকাশ পায় আপন মহিমায়।

বৈচিত্র্যময় শব্দযোজনা ও ভাষা প্রকাশের অনন্যতায় দ্যতিয়েন প্রকাশ করেছেন বাঙালি সংস্কৃতির নানা কথা। শব্দ প্রয়োগের দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজব্যবস্থার নানা চিত্র। তাঁর রচনা সরস, সরল ও সাবলীল। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপকে তিনি যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন অবলিলায়, তেমনি আরবি ও ফারসি শব্দের প্রকাশে উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশের তৎকালীন সময়ের সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। বিশেষ শব্দাবলির প্রয়োগ যে পৃথক প্রেক্ষাপটকে ফুটিয়ে তুলতে পারে, দ্যতিয়েনের রচনা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের তিনি সহজ ও ঝরঝরে গদ্য উপহার দিয়েছেন । শব্দচয়ন, উপস্থাপন, যুক্তিপ্রয়োগ, তথ্য ও তত্ত্বের ঠাসবুনন তাঁর রচনাকে করেছে অনন্য। গদ্যে তাঁর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার জোরেই তিনি হয়েছেন স্বতন্ত্র। রচনায় তৎসম ও আটপৌরে বাংলা শব্দের মেলবন্ধনে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক অভিনব গদ্যছন্দ। যার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য আশির্বাদপুষ্ট হয়েছে এবং লেখক হিসেবে তাঁর এক নতুন সত্তা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মন্তব্য ও বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাঁর নিজস্ব দার্শনিক প্রত্যয় দ্বারা ব্যাখ্যাত। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যার গদ্য রচনা বাংলা ও বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে তিনি এই ভাষার চর্চা করেছেন এবং বাংলাভাষার সাহিত্য সৃষ্টিতে অংশ নিয়েছেন। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষাকে আয়ত্তে এনেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী শৈলী সৃষ্টিকারী সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন, সেখানে অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা। হৃদয়-নিঃসৃত ভালোবাসা না থাকলে সৃষ্টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভালোবাসা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ের মিলিত রূপ তাঁর গদ্য। সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও ঋজু ভঙ্গিতে তাঁর রচনা সহজ সরল সাবলীল ও অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে পাঠকের সঙ্গে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় তিনি বাংলা ভাষাকে বরণ করেছেন অন্তরের ভাষারূপে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখকসত্তায়। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন সাহিত্যিক তথা বাঙালি গদ্য সাহিত্যিক।

টীকা

১. উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), ভাষাতাত্ত্বিক, খ্রিষ্টান মিশনারি।
২. হানা ক্যাথেরিন মুলেন্স (১৮২৬-১৮৬৩) রচনা করেন *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) গ্রন্থটি।
৩. ড. মার্টিন কেম্পশেন একজন রবীন্দ্র-অনুরাগী এবং রবীন্দ্র-অনুবাদক ও গবেষক। জন্মসূত্রে তিনি জার্মান কিন্তু ভারতবর্ষে আছেন প্রায় চল্লিশ বছর। বর্তমানে তিনি জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আদৃত হয়েছিলেন সে-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন।
৪. পোল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, বাংলা থেকে পোলিশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ অনুবাদ করছেন।
৫. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কাজ করছেন।

৬. যুক্তরাজ্যের কবি, গবেষক ও রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদক।
৭. জাপানি রবীন্দ্র গবেষক।

সহায়কপঞ্জি

অধীর দে (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)। *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা*। সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা।
অনীক মাহমুদ (১৯৯৭)। *আধুনিক সাহিত্য পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
অভিজিৎ মজুমদার (২০১৬)। *শৈলীবিজ্ঞান এবং অধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব*। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৩)। *বীরবল ও বাংলা সাহিত্য*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *সম্পা.* (১৯৭৮)। *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (প্রথম খণ্ড)। অশোক দাশ মঞ্জুষা, কলিকাতা।
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৬)। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
আনিসুজ্জামান (২০০১)। *পুরোনো বাংলা গদ্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
আহমদ শরীফ (২০০০)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
উইলিয়াম কেরী (১৯৭২)। *ইতিহাসমালা*। সম্পাদক : ফাদার দ্যতিয়েন। গাঙচিল সংস্করণ, কলকাতা।
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (১৯৯৯)। *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি*। দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা ।
খালেদ হোসাইন (১৯৮৫)। *আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
নবেন্দু সেন (১৯৯০)। *বাংলা গদ্য স্টাইলিসটিক্স*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
পবিত্র সরকার (২০০৬)। *গদ্যরীতি পদ্যরীতি*। সাহিত্যলোক, কলকাতা।
পবিত্র সরকার (২০১২)। *বাংলা লেখার সহজ পাঠ*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
পবিত্র সরকার (২০১৮)। *ভাষাস্পর্শ*। সাহিত্যলোক প্রকাশক, কলকাতা।
ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (২০১৫)। 'সাহিত্য হবে তখন, যখন ভেতরে গান থাকবে : ফাদার পল দ্যতিয়েন' *প্রথম আলো*, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা।
ফাদার দ্যতিয়েন (১৯৭১)। *গদ্যসংগ্রহ*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
ফাদার দ্যতিয়েন (২০১৩)। *আটপৌরে দিনপঞ্জি*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
ফাদার দ্যতিয়েন (২০১৫)। *লালপেড়ে গল্পাবলি*। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গোথাল্স লাইব্রেরি, কলকাতা।
ফাদার দ্যতিয়েন (২০১৭)। *সাদাসিধে খসড়া*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
বদিউর রহমান (২০১৫)। *ধ্রুপদী সাহিত্যতত্ত্ব*। অবসর প্রকাশ, ঢাকা।
বিভাবসু দত্ত (২০১৪)। *বিদ্যাসাগরের গদ্য শৈলী*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৫)। 'বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য', দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৮ ডিসেম্বর, ঢাকা।
ভূদেব চৌধুরী (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)। *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।
মনসুর মুসা (১৯৯৫)। *বাঙলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মনোমোহন ঘোষ (১৯৪৯)। *বাংলা গদ্যের চার যুগ*। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, কলকাতা।
মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় (২০১৬)। 'ফাদার দ্যতিয়েন : তাঁর গদ্য'। *কালি ও কলম*। ঢাকা।
মুহম্মদ আব্দুল হাই (১৯৭৯)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। অহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান (২০১৪)। *আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান ও সাহিত্যবিচার*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
সবিতা চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২)। *বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক*। নয়া প্রকাশ, কলিকাতা।
সুরঞ্জন মিদ্দে (২০১২)। *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*। রূপসী বাংলা, কলকাতা।
সৌরভ সিকদার (২০১৪)। *বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা*। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
সৌরভ সিকদার (১৯৯৯)। *স্টাইলিসটিকস বাংলা ভাষা ও সাহিত্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
হরপ্রসাদ মিত্র (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)। *সাহিত্যের নানাকথা*। নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা।